ব্যাপ্তি লক্ষণের ব্যাখ্যা ও ব্যাপ্তিগ্রহের উপায়

হেতুজ্ঞান, হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রভৃতি প্রত্যক্ষমূলক জ্ঞানকে ভিত্তি করে যে যথার্থ জ্ঞান জন্মে তাকে অনুমা বা অনুমিতি বলে। অন্নংভট্ট অনুমিতির লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেন, 'পরামর্শজন্যংজ্ঞানং অনুমিতি' - অর্থাৎ পরামর্শ থেকে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাকে অনুমিতি বলে। আবার পরামর্শের লক্ষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতাজ্ঞানং পরামর্শঃ' - অর্থাৎ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতাজ্ঞানকে পরামর্শ বলে।

এখন ব্যাপ্তির স্বরূপ নির্ধারণ করতে গিয়ে অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে বলেন, ‘যত্র ধূমস্তত্রাগ্নিরিতি সাহচর্য্যনিয়মো ব্যাপ্তিঃ’ অর্থাৎ যেখানে ধূম সেখানে আগুন - এই সাহচর্যের নিয়মকে ব্যাপ্তি বলে। লক্ষণে ‘ধূম’ শব্দের দ্বারা অনুমানের ‘হেতু’ এবং ‘অগ্নি’ শব্দের দ্বারা অনুমানের ‘সাধ্য’কে বোঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে অন্নংভট্ট ‘যত্র ধূম তত্র অগ্নিঃ’ - এই অংশের দ্বারা ব্যাপ্তির অভিনয় বা আকার দেখানোর চেষ্টা করেছেন। আর ‘সাহচর্য্যনিয়মঃ’ - এটিই ব্যাপ্তির লক্ষণ। সহচর বলতে বোঝায় যে দুটি পদার্থ একসঙ্গে থাকে অর্থাৎ এক অধিকরণে থাকে, সেই দুটি পদার্থকে সহচর বলে। সহচর, সমানাধিকরণ ও একাধিকরণবৃত্তি সমার্থক শব্দ। নিয়ম শব্দের দ্বারা নিয়মিত সামানাধিকরণ্য বোঝানো হয়েছে। যে সামানাধিকরণ্য অবশ্যম্ভাবী, অর্থাৎ যার কোন ব্যতিক্রম হয় না, সেই সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি।

সাধারণতঃ যে কোন অনুমিতিতে কোন এক বিষয়ের ওপর নির্ভর করে অন্য এক বিষয় সম্পর্কে কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যে বিষয় সম্পর্কে কোন কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তাকে অনুমানের ‘পক্ষ’ বলে; পক্ষ সম্বন্ধে যা বলা হয় তাকে ‘সাধ্য’ বা ‘লিঙ্গি’ বলে এবং যার ওপর নির্ভর করে কিছু বলা হয় তাকে ‘হেতু’ বা ‘লিঙ্গ’ বলে। পর্বতে ধূম প্রত্যক্ষ করে যখন অগ্নি অনুমান করা হয় তখন পর্বত হল পক্ষ, পর্বতে আগ্নি আছে বলায় অগ্নি হল সাধ্য, আবার পর্বতে ধূম প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভর করে অগ্নির অনুমান করা হয় বলে, ধূম হল হেতু। আর তাই ধূম ও অগ্নির অর্থাৎ হেতু ও সাধ্যের নিয়ত সহচার সম্বন্ধ অর্থাৎ ‘যেখানে ধূম, সেখানে অগ্নি’ বা ‘যেখানে হেতু সেখানে সাধ্য’ - এমন সহচার-ভাবই হল সাহচর্য নিয়ম বা ব্যাপ্তি।

সহচর-ভাব বা সাহচর্য হল সামানাধিকরণ বা একাধিকরণ। যাদের অধিকরণ বা আশ্রয় সমান তারা সামানাধিকরণ। ‘যেখানে ধূম্, সেখানে অগ্নি’ - একথার অর্থ হল, যে অধিররণে ধূম থাকে সে অধিকরণে আগ্নিও থাকে। ধূম্ ও অগ্নির মধ্যে তাই সাহচর্য বা সামানাধিকরণ্য আছে। কিন্তু কেবল সাহচর্য বা সামানাধিকরণ্যকে ব্যাপ্তি বলা যায় না। ব্যাপ্তি হল সাহচর্যের নিয়ম বা সামানাধিকরণ্যের নিয়ম। আর এই বিষয়টিকে অন্নংভট্ট দীপিকা টীকাতে ব্যাখ্যা করেছেন।

অন্নংভট্ট দীপিকাতে ব্যাপ্তির লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেন, ‘হেতুসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিসাধ্যসামানাধিকরণ্যম্ ব্যাপ্তি।’ অর্থাৎ হেতুর অধিকরণে থাকে এমন যে অত্যন্তাভাব, সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হয় না এমন যে সাধ্য, সেই সাধ্যের সামানাধিকরণ্যই (হেতুতে থাকাই) হল ব্যাপ্তি। বিষয়টিকে আমরা আরো সহজভাবে বলতে পারি, যে অধিকরণে বা স্থানে যে পদার্থের অত্যন্তাভাব থাকে, সেই অধিকরণে সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী (অর্থাৎ সেই পদার্থটি, কেননা অভাবের প্রতিযোগী হল, যার অভাব সেই পদার্থটি) কখনই বর্তমান থাকে না, কারণ অভাব যা এখানে অত্যন্তাভাব ও তার প্রতিযোগীর একত্রে অবস্থান সম্ভব নয়। কিন্তু যে অধিকরণে হেতু থাকে, সেই অধিকরণে সাধ্যের উপস্থিতি থাকে, সাধ্যের অত্যন্তাভাব থাকে না। হেতুর অধিকরণে সাধ্যটি অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী নয়, কারণ অভাব ও তার প্রতিযোগী একসাথে অবস্থান করে না। হেতুর অধিকরণে সাধ্য হল অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী। হেতুর অধিকরণে সাধ্যের অভাব আছে এমনটা বলা চলে না। পরন্তু এমন কথা বলতে হয় যে, হেতুর অধিকরণে সাধ্য অবশ্যই আছে।

এক্ষণে আমরা অন্নংভট্ট প্রদত্ত পূর্বোক্ত লক্ষণটির বিচার করে দেখব কোন দোষ আছে কিনা। লক্ষণটি যদি সৎ হেতুক অনুমিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় এবং কোন অসৎ হেতুক অনুমিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হয়, তাহলে বলা যায় লক্ষণটি নির্দোষ। প্রসিদ্ধ একটি সৎ হেতুক অনুমিতি হল ঃ 'পর্বতঃ বহ্নিমান ধূমাৎ' - এই অনুমিতির পক্ষ = পর্বত, সাধ্য = বহ্নিত্ব ও হেতু = ধূমত্ব। ব্যাপ্তির লক্ষণটি ছিল হেতুর অধিকরণে থাকে এমন যে অত্যন্তাভাব, সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হয় না এমন যে সাধ্য, সেই সাধ্যের সামানাধিকরণ্য হেতুতে থাকাই হল ব্যাপ্তি। এখন ব্যাপ্তির এই লক্ষণটি উক্ত অনুমিতির স্থলে প্রয়োগ করে দেখা যেতে পারে। এই অনুমিতির -

হেতু = ধূম।

হেতুর অধিকরণ = ধূমের অধিকরণ, যেমন মহানস, গোষ্ঠ ইত্যাদি। কারণ এই সব স্থলে ধূম থাকে।

হেতুর অধিকরণে থাকে এমন যে অত্যন্তাভাব = মহানস, গোষ্ঠ ইত্যাদি স্থলে থাকে এমন যে অত্যন্তাভাব। যেমন ঘটের অত্যন্তাভাব, পটের অত্যন্তাভাব ইত্যাদি।

ঐ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী = ঘট, পট প্রভৃতি। (কারণ যার অভাব, তাই সেই অভাবের প্রতিযোগী হয়)।

অতএব সাধ্য বহ্নি ঐ অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী হল। (কারণ মহানসে আর যার অভাব থাক বহ্নির কখনো অভাব থাকে না)।

এরূপ সাধ্যের(বহ্নির) সামানাধিকরণ্য হেতু ধূমে আছে। সুতরাং এই সৎহেতুক অনুমিতিস্থলে লক্ষণ সমন্বয় হল।

এবার একটি অসৎ হেতুক অনুমিতির ক্ষেত্রে লক্ষণটি প্রয়োগ করে দেখা যেতে পারে। অসৎ হেতুক অনুমিতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল - পর্বতঃ ধূমবান বহ্নেঃ। এই অনুমিতির -

হেতু = বহ্নি

হেতুর অধিকরণ = বহ্নির অধিকরণ। উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড(অয়োগোলক), মহানস ইত্যাদি। কারণ এসব স্থানে বহ্নি থাকে।

হেতুর অধিকরণে থাকে এমন যে অত্যন্তাভাব = উত্তপ্ত লৌহপিণ্ডে থাকে এমন যে অত্যন্তাভাব। যেমন ধূমের অত্যন্তাভাব। কারণ উত্তপ্ত লৌহপিণ্ডে কখনো ধূম থাকে না।

এই অভাবের প্রতিযোগী = ধূম।

সুতরাং সাধ্য ধূম ঐ অভাবের অপ্রতিযোগী না হয়ে প্রতিযোগী হয়ে গেল। সাধ্য ধূম অপ্রতিযোগী হলে তবে লক্ষণ সমন্বয় হত। ফলে অসৎহেতুক অনুমিতি স্থলে লক্ষণ প্রযোজ্য না হওয়ায় লক্ষণের কোন অতিব্যাপ্তি দোষ হল না। আপাত দৃষ্টিতে ব্যাপ্তির লক্ষণটি যথাযথ।

অন্নংভট্ট সম্মত ব্যাপ্তিগ্রহ বা ব্যাপ্তিজ্ঞান লাভের উপায়

আমরা জানি পর্বতে ধূম দেখে অগ্নি বা বহ্নি অনুমানের ক্ষেত্রে ব্যাপ্তিজ্ঞানের অবশ্যই প্রয়োজন। এই ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট তাঁর তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে বলেন, ‘যেখানে ধূম সেখানে আগুন’ - এই সাহচর্যের নিয়মই ব্যাপ্তি, আর এই নিয়মের জ্ঞানই ব্যাপ্তি-জ্ঞান। তা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু এই ব্যাপ্তিজ্ঞান লাভের উপায় কি ? অন্নংভট্টের মতে ব্যাপ্তিজ্ঞান লাভের উপায়গুলি হল নিম্নরূপ ঃ

প্রথমত ঃ ভূয়োদর্শন - ব্যাপ্তিজ্ঞান লাভের উপায় সম্পর্কে অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে বলেছেন, ‘ভূয়োদর্শনেন’। ‘ভূয়ঃ’ শব্দের অর্থ ‘পুনঃ পুনঃ’ এবং ‘দর্শন’ শব্দের অর্থ ‘সহচার দর্শন’। তাহলে সামগ্রিকভাবে ‘ভূয়োদর্শন’ শব্দের অর্থ পুনঃ পুনঃ সহচার দর্শন বা বলা যায় হেতু ও সাধ্যের পুনঃ পুনঃ সহচার দর্শন। যেমন হেতু ও সাধ্য বা ধূম ও অগ্নির পুনঃ পুনঃ সহচার দর্শন। যথা মহানস, গোষ্ঠ, চত্ত্বর, যজ্ঞক্ষেত্র প্রভৃতি ক্ষেত্রে ধূম ও অগ্নির নিয়মিত বা পুনঃ পুনঃ সহচার দর্শন। আর এইভাবে আমরা দুটি বিষয়ের ভূয়োদর্শন বা পুনঃ পুনঃ সহচার দর্শনের দ্বারা তাদের মধ্যে যে ব্যাপ্তি সম্পর্ক আছে এই জ্ঞান লাভ করি।

এই পুনঃ পুনঃ সহচার দর্শন বলতে অনেক সংখ্যক দর্শনের সমাহার বোঝাতে পারে, আবার অনেক সংখ্যক অধিকরণে দর্শন বোঝাতে পারে, কিংবা অনেকগুলি সাধ্য ও হেতুর দর্শন বোঝাতে পারে। কিন্তু এর অর্থ যাই হোক না কেন অন্নংভট্টের মতে, কেবল সহচার দর্শনের দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্ভব নয়। তিনি একটি সহজ দৃষ্টান্তের দ্বারা বিষয়টিকে সহজবোধ্য করার চেষ্টা করেছেন।

ঘট মাটি দ্বারা নির্মিত বলে প্রত্যেক ঘটে পার্থিবত্ব আছে। আবার যাবতীয় মৃৎপাত্র মাটি দ্বারা নির্মিত হওয়ায় তাতেও পার্থিবত্ব থাকবে। পেরেক লৌহ নির্মিত বলে তাতে লৌহত্ব আছে, আবার ছুরিকা লৌহ নির্মিত বলে তাতেও লৌহত্ব থাকে। এখন একটি ঘটে যদি পেরেক দ্বারা আঁচড় কাটা যায়, তবে ঐ ঘটে লোহার দাগ বসে যায়।

এইভাবে উক্ত ঘটে 'পার্থিবত্ব ও লৌহলেখ্যত্ব' - এই দুটির সহচার দর্শন হয়। একইভাবে অন্যান্য ঘটেও পেরেকের আঁচড় বসে যাবে। আবার অন্যান্য মৃৎপাত্রগুলিতে যদি পেরেকের আঁচড় কাটা যায়, তবে ঐ সকল পার্থিব পদার্থেও লৌহলেখ্যত্বের সহচার দেখা যাবে। এইভাবে শত শত বার পার্থিবত্ব ও লৌহলেখ্যত্বের সহচার দর্শন হতে পারে। কিন্তু শত শত বার পার্থিবত্ব ও লৌহলেখ্যত্বের মধ্যে সহচার দর্শন হলেও তাদের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ আছে - এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কারণ, মণি প্রভৃতিতে তার ব্যভিচার হয়। মণি পার্থিব পদার্থ হলেও লোহা দ্বারা তাতে দাগ কাটা যায় না। তাই মণিতে পার্থিবত্ব থাকলেও লৌহলেখ্যত্ব নাই। সুতরাং বলা যায় পার্থিবত্ব থাকলেই যে লৌহলেখ্যত্ব থাকবে এমন নিশ্চয়তা নাই। তাই অন্নংভট্টের মতে সহচার ভূয়োদর্শনের দ্বারা ব্যাপ্তি নির্ণয় করা যায় না।

এই সমস্যার সমাধানে অন্নংভট্ট তাঁর দীপিকা টীকাতে বলেন, কেবল সহচার দর্শন দ্বারা ব্যাপ্তি জ্ঞান হয় না। ব্যভিচার জ্ঞানের অভাবের সহিত সহচার জ্ঞান দ্বারা ব্যাপ্তি নির্ণয় করা হয়। ন্যায়-বৈশেষিক মতে প্রতিটি ভাব কার্যের উৎপত্তির ক্ষেত্রে অন্যান্য কারণের সাথে সাথে প্রতিবন্ধকের অভাবও একটি অন্যতম কারণ। ব্যাপ্তিজ্ঞান একটি ভাব পদার্থ। কিন্তু ব্যভিচারজ্ঞান তার প্রতিবন্ধক। যে ক্ষেত্রে ব্যভিচার জ্ঞান থাকে সে ক্ষেত্রে ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্ভব নয়। পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তে পার্থিবত্ব ও লৌহলেখ্যত্বের সম্বন্ধের ক্ষেত্রে ব্যভিচার থাকায় ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্ভব হয় না। তাই ব্যভিচার জ্ঞানের অভাবও ব্যাপ্তি জ্ঞান লাভের একটি অন্যতম কারণ। আর এইভাবে ব্যভিচার জ্ঞান বিরহ সহকৃত সহচারের জ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞান লাভের সহায়ক।

অন্নংভট্টের মতে এই ব্যভিচার জ্ঞান দুই প্রকার। যথা নিশ্চয় ও শঙ্কা। যেক্ষেত্রে নিশ্চিত ব্যভিচার জ্ঞান আছে, সেক্ষেত্রে ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্ভবই নয়। ব্যভিচার জ্ঞানের সংশয়ও ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক। যতক্ষণ সংশয় থাকবে, ততক্ষণ ব্যাপ্তিজ্ঞান হবে না। কোন কোন ক্ষেত্রে তর্ক দ্বারা এই সংশয়ের নিরসন হতে পারে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এই সংশয় উৎপন্নই হয় না অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধভাবেই সংশয়ের অভাব থাকে।

যেখানে ব্যাপ্তি প্রসঙ্গে কোন সংশয়ের অবকাশ থাকে, যেমন ধূম ও অগ্নির মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রসঙ্গে যদি কেউ সংশয় প্রকাশ করেন, তবে সেক্ষেত্রে কার্য-কারণভাব প্রসঙ্গের উল্লেখ করে ‘তর্কে’র দ্বারা ঐ সংশয়ের অবসান ঘটিয়ে ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়। এখানে ‘তর্ক’ বলতে ‘আরোপ’ অর্থাৎ বিপরীত সিদ্ধান্তের আরোপ - কে বুঝতে হবে। কোন প্রমাণের সাহায্যে যথা প্রত্যক্ষ কিংবা অনুমানের সাহায্যে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, সেই সিদ্ধান্তের বিরোধী সিদ্ধান্ত আরোপ করে দেখানো হয় যে, বিরোধী সিদ্ধান্তটি মিথ্যা, তাই মূল সিদ্ধান্তটি সত্য। নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টিকে সহজবোধ্য করা যেতে পারে।

ধরাযাক ধূম ও অগ্নির মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধে যদি সংশয় দেখা দেয়, তবে কার্য-কারণ-ভাব-ভঙ্গ-প্রসঙ্গ-লক্ষণ তর্ক দ্বারা তা নিবৃত্ত হতে পারে। সংশয় স্থলে দুটি বিরুদ্ধ কোটি থাকে। উক্ত সংশয় স্থলে কোটি দুটি হবে এরূপ ঃ 'যেখানে ধূম থাকে, সেখানে অগ্নি থাকে' অথবা 'যেখানে ধূম থাকে সেখানে অগ্নি থাকে না'। এখানে তর্ক দ্বারা দেখানো হবে যে, দ্বিতীয় কোটিকে স্বীকার করলে কার্য-কারণ-ভাব অস্বীকার করতে হয়। এই তর্কটি হল এরূপ ঃ 'ধূম যদি অগ্নির ব্যভিচারী হয়, তবে ধূম অগ্নির কার্য হবে না।' এর অর্থ হল - আমরা সকলে স্বীকার করি যে, অগ্নি কারণ আর ধূম হল তার কার্য। কারণ ভিন্ন কার্য উৎপন্নই হতে পারে না। কারণ থাকলে তবেই কার্য উৎপন্ন হয়। এখন, যদি বলা হয় ধূম আছে, অথচ অগ্নি নাই - তাহলে এদের মধ্যে কার্য-কারণ-ভাব অস্বীকার করা হয়। কিন্তু তা সম্ভব নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে দ্বিতীয় কোটিকে সত্য বলে ধরলে কার্য-কারণ-ভাব অস্বীকার করতে হয়, তাই তা সত্য হতে পারে না। ফলে দ্বিতীয় কোটির ক্ষেত্রে মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হলে ধূম ও অগ্নির মধ্যে ব্যাপ্তি বিষয়ে যে সংশয় আছে, তাও আর থাকবে না।

ন্যায় মতবাদ অনুসারে তর্ক কেবল সংশয় নিবৃত্ত করে। তর্ক জ্ঞানের সহায়ক, কিন্তু তর্ক থেকে কোন জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। এখানেও তর্ক থেকে শঙ্কারূপ ব্যভিচার জ্ঞানের অভাব প্রতিপাদিত হয়েছে। কিন্তু ধূম ও বহ্নির মধ্যে যে ব্যাপ্তি আছে, সেই জ্ঞান উৎপত্তির জন্য সহচার দর্শনেরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু সহচার দর্শনের অসুবিধা এই যে, আমরা সর্বদাই বিশেষ বিশষ ধূম ও অগ্নির মধ্যে সাহচর্য লক্ষ্য করে থাকি; সকল ধূম ও সকল অগ্নির সাহচর্য প্রত্যক্ষ করতে পারি না। সুতরাং যে সকল ধূম ও অগ্নি প্রত্যক্ষ হচ্ছে না, অর্থাৎ যারা দূরে আছে, অতীতে ছিল, ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে, তাদের মধ্যেও যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ আছে, তা নিশ্চয়ের উপায় কি ? এর উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলেন, অলৌকিক প্রত্যক্ষ দ্বারা তা সম্ভব হয়।

নৈয়ায়িকগণ বলেন, আমরা যেমন বিশেষ বস্তু প্রত্যক্ষ করি, তেমনি বিশেষ সামান্য ধর্মও প্রত্যক্ষ করি। তাঁরা বলেন, ‘সকল মানুষ হয় মরণশীল’ বা ‘সকল ধূমবান বস্তু হয় বহ্নিমান’ - এরূপ দুটি বিষয়ের নিয়ত সম্বন্ধ প্রকাশক বচন অবশ্যই মনুষ্যত্ব এই সামান্যের সঙ্গে মরণশীলতার প্রত্যক্ষ এবং তার মাধ্যমে সকল মানুষের সঙ্গে সকল মরণশীলতার সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ বা ধূমত্ব এই সামান্যের সঙ্গে বহ্নিত্বের প্রত্যক্ষ এবং তার মাধ্যমে সকল ধূমের সঙ্গে সকল বহ্নির সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়। একমাত্র আমরা যখন সকল মানুষের সঙ্গে সকল মরণশীলতার সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করি তখন নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, ‘সকল মানুষ হয় মরণশীল’। একইভাবে বলতে পারি ‘সকল ধূমবান বস্তু হয় বহ্নিমান’।

সুতরাং দুটি বিষয়ের অব্যভিচারী নিয়ত নিরুপাধিক সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি নিশ্চিতভাবে স্থাপন করতে হলে দুটি বিষয়ের সহচার সম্বন্ধের কয়েকটি প্রত্যক্ষ করলেই চলবে না, এই দৃষ্টান্তের মধ্য থেকে দুটি বিষয়ের সামান্যও প্রত্যক্ষ করতে হবে এবং তাদের ভিত্তিতে দুটি বিষয়ের সকল দৃষ্টান্তের সম্বন্ধও প্রত্যক্ষ করতে হবে। আর এটি সম্ভব একমাত্র সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষের মাধ্যমে। এইভাবে অন্নংভট্ট ব্যাপ্তি নির্ণয়ের কথা বলেন।

উক্ত আলোচনা থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, বারংবার সাহচর্যের জ্ঞান হলেই যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হবে, এমন কোন কথা নাই; সহচার দর্শন বারংবার না হলেও যে ব্যাপ্তিজ্ঞান হবে না, এমনও কোন কথা নাই। নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, ব্যভিচার জ্ঞানের অভাবের সহিত সহচার জ্ঞানের দ্বারাই ব্যাপ্তি নিশ্চয় হয়। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষের প্রয়োজন হয়, তবুও অনেকক্ষেত্রে একবারমাত্র প্রত্যক্ষের দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞান জন্মাতে পারে।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ